উপসংহার

মনসামঙ্গল কাব্য ধারার তুলনামূলক আলোচনায় আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে কাহিনী, চরিত্র, সমাজভাবনা প্রভৃতি দিক থেকে কবিদের কাব্যের প্রসঙ্গগত ও মনোভঙ্গীগত তফাৎগুলি দেখাবার চেষ্টা করেছি। এতে দেখা গেছে কাহিনী নির্মাণ, কথনভঙ্গী, তথ্যগত উপাদান, গল্পরসের বৈচিত্র্য সব দিক থেকে কবিতে কবিতে যেমন কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি স্বাতন্ত্র্য আছে ধারাগত দিক থেকে। তবে এই স্বাতন্ত্র্যের পরিসর খুবই সংকীর্ণ। মনসামঙ্গলের কবিরা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে একই কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন; দৃষ্টিভঙ্গী ও বর্ণনের স্বাতন্ত্র্যে তা কোথাও কোথাও পৃথক রূপ ধারণ করেছে।

আমরা আলোচনায় লক্ষ্য করেছি একই ধারার কবিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার এমন বর্ণনাও পেয়েছি যা কেবলমাত্র একজন কবিই দিয়েছেন। যেমন — পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবি বিপ্রদাস 'দৈত্যসূয় মহাযজ্ঞে' গঙ্গার রন্ধন, শান্তনুর গঙ্গাত্যাগ, গঙ্গার বিলাপ, দেবগণের হাহাকার, গঙ্গার ধর্ম নিরঞ্জন দর্শন, গঙ্গার ধবলত্ব এবং শিবের মস্তকে গঙ্গাধারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, এই ধারার কবি কেতকাদাস সেভাবে করেন নি। কেতকাদাস গঙ্গার ধর্মনিরঞ্জন দর্শন এবং তাঁর দেহের ধ্বলত্ব প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নি। তাঁর লেখায় গঙ্গাবর্জন প্রসঙ্গ অনেক সংক্ষিপ্ত। এভাবে একই ধারার কবিদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি মিলও আছে। উত্তরবঙ্গের ধারার কবি তন্ত্রবিভূতিতে দেখি লখিন্দর যৌবনে পদার্পণ করলেও চাঁদ তার বিবাহ দিচ্ছেন না, তাঁতে মনসার পূজা পেতে দেরী হচ্ছে। তাই নেতোর পরামর্শে মনসা তার মধ্যে কামাবেগ সঞ্চার করেন। কামচঞ্চল লখিন্দর তখন পথিমধ্যে মামী কৌশল্যাকে সামনে পেয়ে ধর্ষণ করে। এই বর্ণনা উত্তরবঙ্গের কবিরা সকলে অনুসরণ করেছেন।

আবার ধরা যাক বেহুলার মুক্তসার নদীতে স্নান প্রসঙ্গটি। স্নানার্থিনী আসন্ন যৌবনা বেহুলার মুক্তা সরোবরে গমনের চিত্রটি কবি বিজয়গুপ্ত এঁকেছেন এভাবে —

বেউলা সাহের কুমারী।
আগে পাছে সখিগণ চলিল সারি সারি।।
বাপে সাজাইয়া দিল স্নানে করে মেলা।
মুখখানি পূর্ণিমার চন্দ্র ছয়ে দন্ত ছোলা।।
আগে নহে যায় বেহুলাগ পাছে না যায় লাজে।
রহিয়া রহিয়া মঙ্গল গাহে সখীগণের মাঝে।।
চাচর চিকুর শোভে তিলক ললাটে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মেঘের নিকটে।।
দশনে মুকুতা পাতি গ অধরে তাম্বুল।
নাসিকার শোভা জেন জিনি তিলফুল।।

নিতম্ব বিস্তার জেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেন ভ্রমর উঝল।।
ক্ষীণ কটী আর স্তন হিয়ায়ে শোভে বড়ি।
সরোবর মধ্যে জেন কমলের কড়ি।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-৩২৩-৩২৪)

বিপ্রদাস — নানা অলঙ্কার পরি অতি অনুপাম
কবরী বেড়িয়া মাল্য সুগন্ধি কুসুম।।
লালাটে সিন্দুর বিন্দু জিনিয়া অরুণ
কি কহিব তার রূপ মোহে জগজন।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১৬৯)

ক্ষেমানন্দ — ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া। বেহুলা নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া।।
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী। মনসার অঙ্গে লাগে গোড়ালির পানি।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৪৪)

নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে তিনজন কবির স্বতন্ত্র বর্ণনা পৃথক পৃথক রূপ তুলে ধরেছে। বিজয়গুপ্ত স্নানার্থে গমনরতা বেহুলার যাত্রাপথ, সঙ্গীসাথী ও রূপের বর্ণনা করেছেন, বিপ্রদাস কেবল বেহুলার রূপের বর্ণনা এবং ক্ষেমানন্দ কেবলমাত্র স্নানের উল্লেখ করে মনসার অভিশাপ বর্ণনা করেছেন। ফলে বিজয়গুপ্তের কাব্যে যেভাবে বেহুলার যৌবনের রূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে কেতকাদাসে বা বিপ্রদাসে তা পাওয়া যায় না।

কবিরা যেহেতু সামাজিক মানুষ তাই চোখে দেখা বা কানে শোনা বিভিন্ন ঘটনার ছাপ তাঁদের রচনায় পড়েই। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের রচনাতেও তা পড়েছে। স্বর্গের উদ্দেশ্যে ভাসতে ভাসতে বেহুলা গোদার ঘাটে উপনীত হলে গোদা বেহুলার রূপে আকৃষ্ট হয়। গোদা বেহুলাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায় কিন্তু বেহুলা গোদার প্রস্তাবে রাজী হয় না। গোদা তাই বেহুলার উপর বল প্রয়োগ করতে যায়। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ সে অভিশপ্ত হয়। এই অভিশাপ দেওয়ার বর্ণনাগুলিকে যদি পর পর রাখি তাহলে দেখতে পাই পূর্ববঙ্গের দুই কবি বিজয়গুপ্ত ও দ্বিজবংশীর কাব্যে মনসা গোদাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

ক) মনসার পায়ে বেউলা কহে কর পুটে।
আপন হাতের বড়শী গোটা আপন পায়ে ফোটে।।
পইরণ কাপড় তার ভাসাইয়া নিল সোতে।
উঠিতে না পারে গোদা প্রাণ শক্তি কোঁতে।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-৪৫৮)

খ) এখানে থাকুক পড়ি স্বরবন্ধ হৈয়া। (দ্বিঃব/পৃষ্টা-৫৮০)

কারণ হিসেবে বলা যায়, পূর্ববঙ্গের সমাজে দেব দেবীর অভিশাপ দেওয়ার প্রথা মানুষের মনে বদ্ধমূল থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কাব্যে দেখি বেহুলা নিজে গোদাকে অভিশাপ দিয়েছে। কেতকাদাসে —

বেহুলা শাপিল তাকে ঃ গোদা পরিত্রাই ডাকে ঃ গোদ লয়্যা নড়িতে না পারি।
নাকে মুখে জল খায় ঃ গোদা ডাকে পরিত্রায় ঃ পার কর সতীগ সুন্দরী।। (কেঃক্ষে/পৃষ্টা-২৬৭)

কেতকাদাস বেহুলার সতীত্বধর্মের শক্তিকে মহিমান্বিত করে তাকে অভিশাপ দেবার শক্তি বা ক্ষমতা দিয়েছেন। বিজয়গুপ্ত বা দ্বিজবংশীর লেখায় বেহুলার সতীত্ব বড় হলেও তিনি মনসার দাসীমাত্র। মনসার কাছে নিজের অসহায়তা জানিয়ে তাঁকে দিয়ে গোদাকে অভিশাপ দিইয়েছেন। কিন্তু কেতকাদাসে বেহুলা নিজেই শক্তিমতী এবং অভিশাপ দেবার শক্তি ধারণ করে। এখানে দেখা যায় কেতকাদাসের বেহুলা মনসার দাসী হলেও নিজেই দেবীরূপা এবং স্বতন্ত্র মহিমার অধিকারিণী। বিজয়গুপ্ত থেকে কেতকাদাসে এই শক্তির রূপান্তর ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের ধারায় কিন্তু মনসাই গোদাকে অভিশাপ দিয়েছেন বেহুলা দেন নি। তবে বেহুলা কিছু প্রতারণা করেছেন। এই প্রতারণার কথা পূর্ববর্তী দুটি ধারাতে নেই। এখানে দেখা যায়, গোদার দুই স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিবাহিতা বেহুলার প্রতি তার মোহ জন্মায়। বেহুলা তখন গোদার হাত থেকে বাঁচার জন্য গোদাকে এক সর্বনাশা বুদ্ধি দেয়। সেই অনুসারে ঘরে আগুন লাগিয়ে দুই স্ত্রী, বিধবা মা সকলকে পুড়িয়ে মেরে সব দায় মুক্ত হয়ে গোদা বেহুলার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে যাঞা করে। অনন্যোপায় বেহুলা এবার বিপদ বুঝে দেবী মনসাকে স্মরণ করে। মনসা গোদাকে অভিশাপ দিয়ে নিজ দেবদাসীকে রক্ষা করে। এখানে উত্তরবঙ্গের কবিরা বেহুলার মাধ্যমে গোদার পারিবারিক সর্বনাশের যে চিত্র এঁকেছেন তা থেকে আমরা দুরকম অনুমান করতে পারি —

ক) সম্ভবত উত্তরবঙ্গের সমাজে পুরুষের মোহ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহিতা নারীরা কোন অসম্ভব শর্ত আরোপ করে কিংবা অন্য কোন কৌশলে পুরুষকে নিরস্ত করত।

খ) কিংবা এমনও হতে পারে, এই অঞ্চলে সতীন সমস্যা প্রকট ছিল। সতীনের কোন্দল ভয়ে নারী, এরকম কোন বুদ্ধি পুরুষকে নিতে বাধ্য করত।

কবিদের সমকালের কোন ঘটনা কিংবা কোন কিংবদন্তির স্মৃতি এরূপ কাহিনী বর্ণনার পিছনে ক্রিয়াশীল থাকতেও পারে। বহুবিবাহ সম্বন্ধে সমাজ মানসের প্রতিক্রিয়াও এর পিছনে থাকা সম্ভব।

উত্তরবঙ্গের কবিরা লখিন্দরের মামী হরা দোষের কথা বলেছেন। এর সঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মামাশ্বশুরের প্রতিশোধ নেবার প্রসঙ্গ পাই। বেহুলা স্বর্গপথে ভেসে যাওয়ার সময় ভাসতে ভাসতে মামাশ্বশুর মধুসূদন দানীর ঘাটে উপনীত হয়। মধুসূদন দানী ভাগ্নেবধূর সমস্ত পরিচয় জেনেও প্রতিশোধ স্পৃহা বশে বেহুলার উপর বল প্রয়োগ করে নিজ স্ত্রীর প্রতি লখিন্দরের বলাৎকারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন।

মোর নারী গিয়াছিলে সরোবর জলে।
পথে লাগ পাঞা বালা হরিয়াছে বলে।।
জানিয়া হরিল বালা সহোদর মামী।
সেই দুঃখে তুমাকে হরিব আমি।।

জানিয়া করিব আমি মহা মহাপাপ।
যেমতে খন্ডিবে আমার দারুণ মনস্তাপ।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা-২৮১)

এখানে প্রতিশোধ স্পৃহা অতি প্রবল বলে মামাশ্বশুর ভাগ্নে বউ-এর উপর বল প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। অন্যপক্ষে পূর্ববঙ্গের কবি ষষ্ঠীবরের কাব্যে বেহুলার মামাশ্বশুর ভাগ্নে বউয়ের মুখ দেখেছেন বলে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন।

ধনপতি সাধু তবে পাইল মহাতাপ।
কি ক্ষেণে পোহাইল নিশি হৈল মহাপাপ।।
অধর্মের চিহ্ন হৈল নরকে গমন।
ভাগিনা বধূর মুই দেখিনু বদন।। (ষঃদ/পৃষ্ঠা-২১৭ বাইশা)

দেখা যাচ্ছে একই কাহিনী দুই ভিন্ন সমাজ পরিবেশে লালিত কবি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। এভাবেই মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে কবিদের মনোভঙ্গীগত স্বতন্ত্রতা এসেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে দেবসভায় লখিন্দরের প্রাণদানের কারণে মনসার বিষঝাড়নের প্রসঙ্গোপকরণটিতেও অনুরূপভাবে কবিদের স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। মনসার বিষঝাড়ার বর্ণনা বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

নারায়ণদেব —	য়াগমন্ত্র পরি পদ্মা জল পরা দিল	
	অস্তি চর্ম্ম লখাইর জে একত্র হইল।।	(পৃষ্ঠা - ২৬৭)
বিজয়গুপ্ত —	তিন অক্ষর মন্ত্র পদ্মা জপে ধীর ধীর।	
	অমৃত কুম্ভের জল দিয়া সিঞ্চিল শরীর।।	(পৃষ্ঠা - ৫০৩)
ষষ্ঠীবর —	উঝা হইলা গারড়ী মনসা হইলা শিষ।	
	আদিমন্ত্রে আগমে ঝাড়িতে বৈসে বিষ।।	
	আদ্যমন্ত্র পাইয়া তবে বিষ নষ্ট হৈল।	
	চান্দের সুন্দর লখাই বর্তিয়া উঠিল।।	(পৃষ্ঠা - ২৩৮ বাইশা)
বিপ্রদাস —	মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে	
	ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে ওঠে।	(পৃষ্ঠা - ২১১)
বিষ্ণুপাল —	হাঁস্যে হাঁস্যে মনসা মড়া নিলেন কোলে।	
	হাথে কর‍্যা নিল্যা মা সুবর্ণ বিউনি।	
	বিউনির বাএ লখাএর সঞ্চারে পরানি।।	(পৃষ্ঠা - ১২৩)

উত্তরবঙ্গের কবি তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মনসা লখিন্দরের শিয়রে বসে তিন তালির আঘাতে সমস্ত বিষনাশ করে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মমন্ত্র জপ করে লখিন্দরকে বাঁচান।

মনসামঙ্গল কাব্যের লক্ষ্য মনসার পূজা প্রচার। এই লক্ষ্য নিয়েই কাব্যের কাহিনী বিস্তার। নারায়ণদেব মনসা পূজার ঘটনা যেভাবে বলেছেন তাতে দেখা যায় বেহুলা ডোমনীর বেশ ধারণ করে চাঁদের অন্তপুরে

এসেছে। তাকে সনকা চিনতে পেরেছেন। চাঁদ তবু মনসার পূজা করতে চান নি। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে রাজী হয়েছেন।

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে শূদ্রে ধরে পায়।
পাত্র গণে চাদের আগে কহিআ বোজায়।। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৭৮)

চাঁদের খুড়া বঙ্কাইধর এসে চাঁদকে পূজা করতে বলেছেন। সবার অনুরোধে চাঁদ মনসা পূজা করতে রাজী হয়েছেন বটে তবে বাম হাতে পিছন দিক দিক ফিরে পূজা করবেন বলেছেন "পিচ দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিব।" (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮০) কারণ মনসা জাতিহীন, তাঁর জাতির বিচার নেই "জাতি হিন জাতি তোমি না কর বিচার।" (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮০) শেষ পর্যন্ত চাঁদ পূজা করেছেন। এবং করজোড়ে মনসার কাছে বলেছেন তাঁর পূজা না করার কারণ চন্ডীর নির্দেশ — "তোমার সনে কন্দল বাড়াইল পার্বতি।" (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮৪)

বিজয়গুপ্তের কাব্যেও দেখি বেহুলা ডোমকন্যা বেশ ধরে চাঁদ সদাগরের পুরীতে এসেছে।

চম্পক নগর দেখি কৌতুক হইল বড়।
ডোম কন্যা বেশ ধরিল সত্বর।।
আভরণ হইল কন্যা ডোম নারী বেশ।
চম্পক পুরীতে বেউলা করিল প্রবেশ।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫২৩)

ডোম নারীকে দেখে চাঁদ অন্দরে খবর নিতে গেছেন আর চাঁদকে দেখে বেহুলা ভয়ে পালিয়ে গেছে। তখন সনকা "নিসান চাহিতে গেল ছয় বধূ লইয়া।" (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫২৭) নিশান চাওয়া অর্থাৎ নিশানা দেখা। বেহুলা স্বর্গের উদ্দেশ্যে লখিন্দরকে নিয়ে যাত্রা করার সময় কিছু কিছু নিশানা রেখে গিয়েছিল। এগুলি আর কিছু নয় লোক বিশ্বাসে গড়ে ওঠা ইন্দ্রজাল। এগুলি মানুষের আদিম বিশ্বাস বোধ। সনকা গিয়ে দেখলেন —

ক) সিদ্ধ ধান্য মেলিছে অঙ্কুর। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫২৮)

খ) সিদ্ধ হরিদ্রায় দেখে মেলিয়াছে পাত। (বিঃগু/পাঠান্তর/পৃষ্ঠা - ৫২৮)

এ সময়ে মুকাই পন্ডিত এলেন। মুকাই সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে চাঁদ বিস্মিত হয়েছেন। মুকাই তাঁকে চৌদ্দ ডিঙাসহ পুত্রদের ফিরে আসার সংবাদ দিয়েছেন। মুকাই তাঁকে পদ্মাচরণ পূজা করতে বলেছেন। চাঁদের সমস্যা থেকেই গেছে।

যেই হস্তে পূজি আমি শিবের চরণ।
সেই হস্তে পদ্মার পূজা করিব কেমন।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩০)

বেহুলা এদিকে সনকাকে বলেছে —

শ্বশুরে না পূজে যদি দেবী বিষহরি।
ধনজন লইয়া আমি যাব দেবপুরী।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩১)

রাত্রি প্রভাতে মুকাই পন্ডিত ছাড়াও বেহুলা নিজে সবার সামনে চাঁদকে পদ্মার পূজা করতে বলেছে। পাত্রমিত্র, বন্ধুগণ সকলেই চাঁদকে পূজা করতে বলেছেন। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩৪) তখন চাঁদ বামহস্তে পূজা করতে রাজী হয়েছেন।

বামহস্তে পূজা আমি করিব তাহার। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩৫)

নারায়ণদেবের কাব্যে দেখি সনকা, প্রজাগণ, সনকার পিতা রঘুদেব এবং রাজ্যের ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা চাঁদকে পূজা করতে বলেন। সনকা তো আত্মহত্যা করবেন বলে ভয় দেখান — "স্তিরি বধ দিব আমি তোমার উপর।" (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৭৮) চাঁদের খুড়া বঙ্কাই ধর চাঁদকে তিরস্কার করে তাঁকে পূজা করতে বলেন। কিন্তু চাঁদ মনসার জাতিহীনতার কথা তোলেন।

বিজয়গুপ্তের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় — জাতিহীনতার কথা তিনি বলেন নি। দ্বিতীয়ত চাঁদের কৌলিন্যের কথাও সেখানে নেই। পিছন ফিরে বাম হাতে পূজা করার কথা বিজয়গুপ্তের কাব্যে কেবল বাম হাতের পূজাতে পরিণত হয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদই মনসাকে চন্ডীর বিরোধের কথা বলেছেন। কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেখি দেবী চন্ডী নিজেই চাঁদকে মনসা পূজার কথা বলেছেন।

চান্দোরে ডাকিয়া চন্ডী বলিলা বচন।।
তোমার ঠাঁই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্তি আমি সেই নাহি অন্যপর।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩৫)

নারায়ণদেবের কাব্যে এসব কথা নেই। সেখানে চাঁদই বলেছেন চন্ডীর জোরে তিনি মনসার সঙ্গে বিবাদ করেছেন - নইলে মনসার সঙ্গে বিবাদ করার শক্তি তাঁর নেই "তোমার সনে বাদ করিতে মোর শক্তি নাই।" (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮৪) বিজয়গুপ্তের কাব্যে চন্ডী নিজেই চাঁদকে মনসার সঙ্গে নিজের অভিন্নতার কথা জানিয়েছেন। ফলে চাঁদ স্পষ্টতই জিজ্ঞাসা করেছেন —

এতদিন মা কেনে না কহিলাহে কথা।
মুই নহে জানি পদ্মা সাক্ষাতে দেবতা।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩৬)

মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস দেখিয়েছেন বেহুলা ডোমনী বেশেই সনকাকে দেখা দিয়েছে। বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণ দেবের বর্ণনার মতো ঐন্দ্রজালিক নিশানা দেখার কথা সেখানে নেই। সেখানে কান্ডারী সোমাই

পন্ডিতকে বেহুলার অসাধ্য সাধনের কথা বলেছে। বেহুলা চাঁদকে পূজা করতে অনুরোধ করেছে।

বেহুলা পড়িয়া খিতি পাটের আঁচোলে।
চাঁদোরে প্রণতি করি ধীরে কিছু বলে।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৮)

চাঁদকে বেহুলা, সনকা, সোমাই পন্ডিত বাড়ীর দাসদাসী সকলেই পূজা করার কথা বলেছেন। তাদের কথা শুনে চাঁদ বলেছেন —

না বুঝিয়া সর্বলোকে বলে অনোচিত।
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পন্ডিত।।
পুত্রশোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে।
নেড়া ঝাউয়া দাসী বলে সনকার বুদ্ধে।।
ছয় বধূ বলে ছয় স্বামীর হব্যাষে।
গাথর চাকর বলে সেই অভিলাসে।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৮)

চাঁদ যেভাবে এখানে প্রত্যেকের পূজার অনুরোধের পিছনে তাদের স্বার্থবুদ্ধি দেখেছেন তাতে অন্যান্য কবির চাঁদের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য তৈরী হয়। মনে হয় এই সব অংশে যুগগত চিন্তাচেতনা ঢুকে পড়ে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী দেব মাহাত্ম্য মূলক। কিন্তু এই সব কাহিনীর মধ্যে কবির সমকালের জীবন বোধ অনেকটাই ঢুকে পড়েছে। এবং প্রাচীন কাহিনীর পাত্রপাত্রীর মৌল ধর্মকেও বদলে ফেলেছে।

বিপ্রদাসের কাব্যে একটা জিনিস পাই। চাঁদ মনসার শক্তি প্রত্যক্ষ দেখতে চান —

প্রত্যক্ষ দেখিয়া পূজি মনসা চরণ।
স্থলে যদি চলি ডিঙা জায় মোর দ্বারে।
তবে সে মহিমা জানি পূজিব তাঁহারে।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৮)

তাই মনসার আদেশে শেষনাগ এবং আরও সাত জন সাধুর সপ্তডিঙা নিয়ে গেছে।

সাত ডিঙা পৃষ্ঠে করি লৈল সাত নাগ।
এড়িল চাঁদোর দ্বারে সাত ভাগে ভাগ।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৮)

এরপর চাঁদ মনে আর সংশয় রাখেন নি

বেহুলার বাক্য শুনি বলিল রাজন।
পূজিব পরম ভক্তি মনসা চরণ।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৯)

এখানে লক্ষণীয় হল চাঁদ বাম হাতে পূজা করার কথা বলেন নি। এটা পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিদের কাব্যেই দেখা যায়। দ্বিতীয়ত এখানে চন্ডীর নিষেধের কথা বা মনসা ও চন্ডীর ঐক্যের কথা — এসব কিছুই আসে নি। তৃতীয়তঃ বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদ অতিশয় ভক্তিভরে মনসা পূজা করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত

নিজের মনসা নিন্দার শাস্তি হিসেবে মনসাকে তাঁর মস্তকে চরণ প্রহার করতে বলেছেন।

তবে চাঁদো কর জোড়ে করে নিবেদন
বহু নিন্দা কৈল মুঞি এ পাপ বদন।
মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার
দোষ নিন্দা এবে শান্তি হউক আমার। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২৩১)

মনসা তখন 'হাসি পদাঘাত কৈল চাঁদোর মস্তকে।' (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২৩১) এ বর্ণনা পূর্ববঙ্গীয় কবিদের কাব্যে দেখা যায় না।

কেতকাদাসের কাব্যে বেহুলা ডোমনী বেশেই দেখা দিয়েছে। তবে সে 'লক্ষ তঙ্কার বিয়নী' নিয়ে বেচতে আসে। বেহুলার পরিচয় পেয়ে সনকা তাকে লখাই এর কথা জিজ্ঞাসা করে। বেহুলা তখন তাকে বলে — কপাট ঘুচায়্যা দেখ লোহার বাসর।।
সেই তৈলে দীপ যদি অদ্যাবধি জ্বলে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে নিজ কোলে।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৮৮)

সনকা দরজা খুলে দেখেন

সিজন ধান্যের গাছ লোহার বাসরে।
কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জ্বলে।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৮৮)

কেতকাদাসের কাব্যে এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি যুক্ত দীপ এবং সিদ্ধ ধানের গাছ দেখে সনকা জেনেছেন লখাই-এর পুনর্জীবন প্রাপ্তি ঘটেছে। লক্ষণীয় এই magical সিদ্ধ ধানের গাছ বা এই ধরনের জিনিস বিপ্রদাসে নেই। পূর্ববঙ্গের কবিদের কাব্যে আছে — আবার কেতকাদাসে আছে। কেতকাদাস আবার বিপ্রদাসের মনসার শক্তি পরীক্ষা বিষয়ে একরকম বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে চাঁদকে সনকা ছাড়া আর কেউ পূজা করার কথা বলেন নি। বেহুলা বলেছে 'চৌদ্দ ডিঙা জলে ভাসে দেখ না আসিয়া' (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৮৯) চাঁদ তবু বেহুলাকে শর্ত দিয়েছেন —

চাঁদ বান্যা বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুকানেতে চৌদ্দ ডিঙা যদি ঘরে যায়।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৮৯)

একথা শুনে মনসা ফণীদের বলেছেন। তারা চাঁদের ডিঙা শুকনো ডাঙায় বয়ে নিয়ে গেছে —

চাঁদ ভাগ্যবান ঃ ডিঙা চৌদ্দখান ঃ নাগেতে বহিয়া দিল। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৮৯)

এই ধরণের motif লোকসাহিত্যের একটা বড় দিক। যাইহোক, এই নৌকা শুকনো ডাঙায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিপ্রদাস এবং কেতকাদাসের মিল আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ধারার কবিদের সঙ্গে

এখানে পশ্চিমবঙ্গ ধারার কবিদের পার্থক্য দেখা যায়। নারায়ণদেবের কাব্যে চাঁদ মনসার পূজা করেন নি। তার কারণ দুটি —

১) চন্ডীর নিষেধ

২) মনসার জাতিধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ

বিজয়গুপ্তের কাব্যে চাঁদ মনসার পূজা করেন নি। তার কারণ

১) চন্ডীর নিষেধ

আবার চন্ডীই তাঁকে বুঝিয়েছেন মনসা ও চন্ডীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। কেতকাদাসের কাব্যে কিন্তু চন্ডীর নিষেধের কথা বলা নেই। সেখানে বরং অন্য একটি কথা চাঁদকে ভাবিয়েছে।

চাঁদ বান্যা বলে মোর বড় অপমান।
কেমনে করিব আমি মনসার ধ্যান।।
যাহা সনে করি আমি বাদ বিসম্বাদ।
তাহার শরণ লব এ বড় প্রমাদ।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৯০)

অর্থাৎ মনসাকে পূজা করতে গিয়ে এতদিনকার বিবাদের কথা মনে করে চাঁদের অপমানবোধ জাগ্রত হচ্ছে। এই 'অপমান' বোধ আর কোন কবির কাব্যে দেখা যায় নি। অন্য কবিদের চাঁদ শিব পূজা ফেলে মনসা পূজা করতে চান নি। কেতকাদাসও বলেছেন —

যেই হাথে পুজিনু সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তায় জয় বিষহরি।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৯০)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই ভেবেছেন —

সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলুঁ বস্যা চৌদ্দ মধুকর।।
হেন মনসার পূজা নাঞি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাছে পায়্যা পঞ্চ নিধি।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৯০)

লক্ষণীয়, চাঁদ এখন বাস্তব বুদ্ধির দিক থেকে ভেবে দেখছেন। আর তিনি পূজা না করে সব হারাতে চান না। তাই অপমান ভয় সত্ত্বেও মনসা পূজা করার কথা ভেবে নিয়েছেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে অপমান বোধ নেই, বিজয়গুপ্তের কাব্যেও নেই। এ ধারণা কেতকাদাসেই পেলাম।

এখন প্রশ্ন হল এই তুলনা থেকে কী পেলাম ? এই তুলনা দুদিকে চিন্তাকে নিয়ে যেতে পারে।

প্রথমত, গল্পের আদি উৎসের দিকে

দ্বিতীয়ত, গল্পের পরিবর্তিত রূপের দিকে।

এই গল্পের বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় মনসার কাহিনীতে পূর্ববঙ্গের ধারায় চাঁদের বাম হাতে মনসা পূজার ধারণা যুক্ত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ধারায় তা নেই। মনে হয় কালক্রমে সেই ব্যাপারটি ভক্তিবাদের প্রবলতায় ভেসে গেছে। বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণ দেবের কাব্যে এই ধারণা মনসা পূজার একটু প্রাচীনতার কথা জানায়। বিপ্রদাসের বা কেতকাদাসের কাহিনীতে কিন্তু ভক্তিবাদের প্রভাব কাজ করেছে। ফলে সেখানে পূজা আছে — ভক্তিনত চিত্তে; তাই চাঁদের মস্তকে মনসার পদ ন্যস্ত হয়েছে। বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণদেব এতটা চাঁদকে নত করেন নি। তার মানে পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা পূজার কাহিনীতে এটা একটা বড় প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়ত, কাহিনীর ধারা তো থেমে থাকে নি। লোক মুখে গায়কের মুখে প্রচারিত হতে হতে যুগ চেতনার ছাপ গ্রহণ করে বদলে গেছে। বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা যেভাবে পূজার বর্ণনা পাই তাতে ব্রাহ্মণ্যবাদের চিত্র ফুটে ওঠে। কেতকাদাসের কাব্যে চাঁদ দীর্ঘ স্তবে মনসাকে তুষ্ট করেছেন।

এদিক থেকে দেখলে একটা জিনিস কতকটা স্পষ্ট হয়। বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণ দেবের কাব্যের লৌকিক উপাদানগুলি এখনো তার প্রচলিত রূপের ভিতর থেকে উঁকি দেয়। তাঁদের কাব্যে লোক জীবনের উপাদানগুলির পরিচয় আছে। মনসার পূজা প্রসঙ্গের আলোচনা থেকে দেখেছি কিছু লোক বিশ্বাস, যাদু বিশ্বাস সে সব কাহিনীতে কাজ করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার পরিচয় পাই।

অন্যপক্ষে বিপ্রদাস ও কেতকাদাসের কাব্যে লৌকিক উপাদানগুলির জায়গায় পুরাণের উপাদান বেশি জায়গা পেয়েছে। এক দিকে যেমন তাঁরা পুরাণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তেমনি প্রচলিত লৌকিক মঙ্গল কাব্যের ভিতরে পৌরাণিক ধ্যানধারণা সঞ্চার করেছেন। পৌরাণিকতার দিক থেকে দেখলে মনে হয় কেতকাদাসের কাব্যেই তার প্রভাব বেশি। বোধহয় কাহিনী লৌকিকতা থেকে ক্রমশ পৌরাণিকতার দিকে সরে গেছে। কেতকাদাসের কাব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে "লৌকিক প্রসঙ্গের আয়তনেও পৌরাণিক পরিমন্ডল রচনার প্রয়াস"[১] তাঁর কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই তুলনায় পরবর্তীকালে লেখা হলেও বিষ্ণুপাল কিন্তু আঞ্চলিক কাহিনী চিত্রই রচনা করেছেন।

উত্তরবঙ্গের কাব্যধারার অন্যতম কবি তন্ত্রবিভূতি। মূলত জীবনরসাত্মক কাব্যধর্মিতায়, পান্ডিত্যে ও শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি মনসামঙ্গলের যে রূপ গড়ে তোলেন তা পরবর্তীকালে এই ধারার অপর দুই কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন মৈত্র অনুসরণ করেন। তন্ত্রবিভূতি মনসামঙ্গল কাব্যের মূলধারার গতানুগতিক অনুসরণ করলেও কোথাও কোথাও উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেন। কাব্যে মালাবতী উপাখ্যানটির

সংযোজন তাঁর নিজস্ব। তিনি হীরার বেশবাসের মাধ্যমে তার চরিত্রের বাস্তব রূপটি গড়ে তুলেছেন।

বারো তালির কাপড়েতে তের তালি দিঞা।
হেন কাপড় পড়ি হীরা মৎস বেচে গিঞা।।
হেন কাপড় পহ্নে হীরা কাঁকলি জুড়িঞা।
ভাঙ্গা খুঞা নিল হীরা বুকে আচ্ছাদিঞা।।
পিতলের কোটি নিল কর্ণেত পহ্নিঞা।
পিতলের হার নিল গলাতে গাথিঞা।। (তঃবি/পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬)

মনে জন্ম বলে দেবীর নাম মনসা — তন্ত্রবিভূতি একথা সরাসরি না বললেও এর তাৎপর্য ধরে যা বলেছেন — 'মনসা মানস সিদ্ধি খন্ডে দুঃখভার'[২] তাতে এই ব্যঞ্জনা আছে। কবি চাঁদের সাতপুত্রের অতিরিক্ত এক পুত্র কুলপাণির কথা উল্লেখ করেছেন যা মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় অভিনব। অন্যান্য কবিরা লৌকিক উপাদান থেকে উপমা ব্যবহার করলেও তন্ত্রবিভূতির কাব্যে ব্যবহৃত লৌকিক উপমা বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

জলের উপরে চান্দো টেপা মৎস্য ভাসে।
রথের উপরে পদ্মা খল খল হাসে।। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ১৯১)

উত্তরবঙ্গের অন্য কবি জগজ্জীবন ঘোষাল কাহিনী গ্রন্থনে ও বর্ণনায় সর্বত্রই তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করেছেন। তবে কাব্যে বন্দনা ও সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর বর্ণনায় তিনি অনন্য মর্যদার দাবীদার। বন্দনাংশে চার লাইনে তিনি একমাত্র দেবী অম্বুজার বন্দনা গান করেছেন এবং রামপ্রসাদের[৩] মতো উপাস্য দেবতার মধ্যে মাতৃরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দৃষ্টি মনসামঙ্গলের অন্য কবিদের মধ্যে দেখতে পাই নি। 'সৃষ্টিপত্তন' বর্ণনায় — মনসাকে ধর্মের নারীরূপ দান ইত্যাদি বর্ণনা 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মপুরাণ' - এর অনুরূপ। জগজ্জীবনের মনসার জন্ম কাহিনী বর্ণনাও অভিনবত্বে মনোরম। হেমন্তঋষির কন্যা গৌরীকে শিবের কয়ালীরূপ ধারণ করে বিবাহের বর্ণনা কবির স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। শিবের ফুল চাষ ও মালঞ্চ নির্মাণ মনসামঙ্গল কাব্যে গতানুগতিক বর্ণনা হলেও কবি এখানে চাষবাসের যে বর্ণনা দেন তা জীবনরসে ভরপুর বাস্তব অভিজ্ঞাত পুষ্ট।

বস্তুত পূর্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গোপকরণের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা কবিদের কাহিনী বয়নে, চরিত্র সৃজনে, জীবনরসের প্রকাশে কোথায় কোথায় স্বাতন্ত্র্য বা মিল আছে বা কোথায় সম্পূর্ণ নতুন প্রসঙ্গ সৃষ্টি হয়ে কাহিনীতে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে তা আলোচনা করেছি। উপসংহারে সেগুলির পুনরুক্তি করছি না। মনসামঙ্গলের কবিরা প্রায় প্রত্যেকে পূর্ববর্তী কবির কাব্য অনুসরণ করেছেন। তবে কবিদের লেখায় এই সব প্রসঙ্গে তাঁদের বিশিষ্টতার প্রকাশ ঘটেছে।

সূত্র নির্দেশিকা

১। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব (সম্পাদিত), মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, পৃষ্ঠা - XV

২। দাস ডঃ আশুতোষ (সম্পাদিত), তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, (ভূমিকাংশ) পৃষ্ঠা - ৮৬

৩। ভট্টাচার্য সুরেশচন্দ্র ও দাস ডঃ আশুতোষ দাস (সম্পাদিত), কবি জগজ্জবন বিরচিত মনসামঙ্গল, (ভূমিকাংশ) পৃষ্ঠা - ৩৯০